ছড়ানো মুক্তা

আমাদের লেখালেখি, সাহিত্য এবং তার শেষ নিয়ে কিছু কথা

স্বপ্নচারী আব্দুল্লাহ

October 17, 2011

6 MIN READ

ছোটবেলা থেকেই অনেক লিখতাম। ডায়েরির পাতাভরা লেখা। সেই লেখা কোন উদ্দেশ্যের জন্য ছিলোনা। ছিলো অনুভূতিদেরকে বন্দী করে রাখার ইচ্ছে থেকে লেখা। কৈশোর থেকেই এই জীবনে অনেক প্রভাবিত হয়েছি। শীর্ষেন্দু, সমরেশ, সুনীল, শরৎ, রবিঠাকুরের লেখার জগতে হারিয়ে যাওয়া। সেই সাথেই ছিলো নসীম হিযাযী আর আবুল আসাদের লেখাগুলোতে পাওয়া আত্মিক উদ্দীপনা। দীর্ঘ এই পাঠক জীবনে লেখকদের লেখনীর স্রোতে ভেসে ভেসে আজ যেন এসে ঠেকেছি কোনো এক বন্দরে।

শীর্ষেন্দুর বইয়ের প্রতি আমার একটা বিশেষ দুর্বলতা ছিলো — সেটা 'পার্থিব' পড়ে খুব বেশি বুঝতে পেরেছিলাম। ভাবনার গভীরে, চরিত্রগুলোর প্রতিটির চিন্তাধারাকে পাঠক হিসেবে এক্সপ্লোর করার ব্যাপারটা অত্যন্ত আনন্দের সাথে উপভোগ করতাম তার সকলে লেখায়। বইটিতে চয়নের অনুভূতিগুলো যেন বুঝতে পারতাম, হেমাঙ্গের কথাও মনে হয় আজো। কী যেন নাম ছিলো মেয়েটার ঝিমলি নাকি অঞ্জলী; আর সেই প্রবাসী মেয়েটা — তাদের চরিত্রের স্বরূপগুলো অনুভব করতে পেরেছিলাম এটা মনে আছে। প্রায় বছর দশেক আগের স্মৃতি হিসবেও এই স্মৃতিচারণটা খুব একটা মন্দ হলোনা!

যখন পড়া শেষ করলাম, তখন কৃষ্ণজীবন ছাড়া প্রায় সমস্ত চরিত্রের প্রতি অভক্তি চলে এসেছিলো। এমনকি এই কৃষ্ণজীবনের মতন উদার মনের লোকটাও বাচ্চা একটা মেয়ের প্রতি তার বিব্রতকর আকর্ষণবোধটাকে বুঝতে পারছিলেন এবং নিজেকে ও মেয়েটিকে পাত্তাও দিচ্ছিলেন! লেখক এই "স্বরূপ"গুলোকেই আমার মতন অজস্র পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। আমি গ্রহণও করেছিলাম তার প্রায় পুরোটাই। কিন্তু বারবার অস্বস্তিতে পড়ছিলাম– আমার মন বলছিলো একটা 'লাস্ট ফিলিংস' নিয়ে আমার বইটা বন্ধ করার দরকার। কিন্তু আমি পাইনি। যদিও এটাই ছিলো আমার পড়া, আর ভালোলাগা সেরা বইগুলোর একটা যাতে লেখকের সাথে দীর্ঘসময় একটা যাত্রা হয়েছিলো। কত পৃষ্ঠা যেন ছিলো, প্রায় হাজারের কাছাকাছি যতদূর মনে হয়...

এর অনেকদিন পরের কথা। শতাধিক বই পড়েছি এরই মাঝে। একদিন 'কায়সার ও কিসরা' হাতে পেলাম। লেখক নসীম হিযাযীর, সেদিন আমি দমবন্ধ করে পড়েছিলাম। একটানা..... একটানা। এই বইটার পাতায় পাতায় ছিলো আমার মুগ্ধতা। খুব বেশিদিন হয়নি আগের মনে রাখার মতন বইটি পড়া– হয়ত আধযুগ। কিন্তু লেখক আমাকে উপহার দিলেন অদ্ভূত একদল অনুভূতি। আসেম নামের সেই ছেলেটার ত্যাগের কথা স্মরণ করে আমার চোখ ভিজেছিলো। সেই মেয়েটা — কী যেন নাম — সামিয়া বা সামিরা টাইপ কিছু — যাকে সে পছন্দ করতো– সে মরে যায়। আমার মনে হয়েছিলো মেয়েটা বোধহয় আমারই খুব কাছের কেউ। তারপর তার ক্রমাগত সত্য খোঁজার যাত্রা। ফুস্তিনা আর ইউসিবা নামের দুই মহিলাকে বিপদ থেকে উদ্ধার। এরপর আরও শত শত পৃষ্ঠার কাহিনী। তাতে ছিলো রোমান আর পার্সি সাম্রাজ্যের উত্থান পতন, পুরো বিশাল যুদ্ধের বর্ণনা একদম বাস্তবের মতন! ইতিহাস যেখানে অবিকৃত ছিলো। চরিত্রগুলো সেখানে অলংকার। চারিত্রিক মাধুর্যের গল্প, রোমান্টিসিজম ছিলো পুরোভাগেই, কিন্তু একচুল কোথাও অস্বস্তিতে পড়েছিলাম বলে মনে পড়েনা। অনৈতিক চাওয়াদের সেখানে প্রশ্রয় পায়নি। ফুসতিনা নামের অদ্ভূত সুন্দর এক নারীর প্রতিমূর্তি আজো আমার বুকের গহীনে জায়গা করে আছে– অথচ আসেম আর ফুসতিনার কাহিনী কী দুর্বার, কী কষ্টের, কতটা হারানোর! কিন্তু সেখানে তো "রোমিও গেলো, আমিও চলে যাবো" বলে জুলিয়েটের বিষ খাওয়ার মতন বিচিত্র রোমহর্ষক অযৌক্তিক 'ভালোবাসা' নেই! বরং সেখানে যেই অনুভূতিদের পাওয়া যায় — তারা হলো বাস্তব, তারা অপেক্ষা করার, তারা কেবলই সবকিছু সুন্দর হবার চেষ্টাকে প্রেরণা দেয়ার...

কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে পড়ে, যেদিন "পূর্ব-পশ্চিম" পড়ছিলাম সুনীলের, সেখানে প্রধান চরিত্রগুলোর একটি যখন তার বাসায় থাকা দূর সম্পর্কের বোনটিকে টেনে রেখে শারীরিক স্পর্শে ব্যাকুল হয়েছিলো — পড়তে গিয়ে তখন একদিকে অদ্ভূত

একধরণের চাঞ্চল্য হচ্ছিলো নিজের মাঝে, আড়ষ্ট হয়ে লজ্জায় বারবার তাকাচ্ছিলাম বড় ভাইয়ের দরজার দিকে — মনে হচ্ছিলো ও এসে দেখে ফেলবে আর হয়ত জেনে যাবে আমি এইসব বাজে জিনিস পড়ছি যা আমার পড়া উচিত না!

এই জায়গাগুলোতেই আমার খটকা আর অস্বস্তি লাগতো। আমি অবারিত শব্দপ্রয়োগে, শব্দচয়নে বিশ্বাসী নই, বরং সন্দিগ্ধ। যেই শব্দগাঁথা আমাদের মনকে ভ্রষ্ট করে, সেই শব্দকে গাঁথা পাঠকপ্রজন্মকে গর্তে ঠেলে দেয়ার নামান্তর বলে মনে হয় আমার কাছে। বহু লেখকের 'রোগাক্রান্ত নীতি'-ময় লেখার পড়ার পর নসীম হিযাযী আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন, উদ্দীপনা দিয়েছিলেন — সুন্দর অনুভূতিরা সুন্দরই থাকে। চাওয়া আর আকাঙ্ক্ষা-কামনাদেরও সুন্দর রূপ থাকে। যেটা নিয়ে সন্দেহের জালে পড়েছিলাম শীর্ষেন্দু আর সুনীলের কাছে। সেই সাহিত্যের প্রভাবে আমার চিন্তাচেতনায় প্রভাব কতখানি ছিলো তা কেবল আমি জানি। চিন্তার এই স্বরূপগুলো আগে বুঝতে পারিনি — ইদানিং পারি। এই অল্প অপপ্রভাবটুকুজীবনে অনেক ক্ষতি এনে দিতে পারে — এনে দেয়।

একদিকে নৈতিক শিক্ষাসম্পন্ন লেখা, আর অন্যদিকে নীতিকে হিসেবে না রাখা — দুইটি লেখাতে যোজন যোজন দুরত্ব। তার সমাজ আর জাতির কাছে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ এনে দেয়, প্রজন্মের চিন্তার প্রভাব বিস্তার করে। এখানে অবশ্য বয়েসের একটা ব্যাপার থাকে। একটা নির্দিষ্ট বয়েসে অনেক কিছুই গা সওয়া আর স্বাভাবিক, যার অনেক কথাই হয়ত কৈশোরের জন্য 'হজমযোগ্য' না। আর এই বিষয়গুলো যে সমস্ত পাঠক জেনে বুঝে নিয়ে সাহিত্য পড়বে — সেটাও আশাপ্রদ না। যাহোক, আমার লেখাতে আমি এই বিষয়টা নিয়ে তর্কবা সমালোচনা করতে বসিনি। আমি লিখছি কেবল দুটো জিনিসের কিছু পার্থক্য দেখাতে, অনুভূতিদের অনুধাবন করতে। কাউকে ছোট করা আমার উদ্দেশ্য নয় একটুও।

আমি অনেক লিখেছি জীবনে — পত্রিকায়, ম্যাগাজিনে, এখানে-ওখানে। কিন্তু এখন একটা জিনিস মনে হয় — আমি কেন লিখি? আমার এই লেখাগুলোর একটা অর্থ থাকা জরুরী। যেখানে জীবনটা অর্থহীন নয়, সেখানে লেখালেখির অর্থ থাকা আবশ্যক। কারণ, লেখালেখি কাজটা খেলো না। এইটা সবাই পারেও না। এইটা একটা অর্জন। আর এই অর্জন যখন ধূলোয় লুণ্ঠিত হবে, সেটা কষ্টকর। নিঃসন্দেহে প্রতিটি কাজেরই হিসেব দিতে হবে একটি নির্দিষ্ট দিন। যখন আমাকে বলা হবে — তোমার এই লেখাতে কতজন পথভ্রষ্ট হয়েছে জানো? ... অথবা, লেখনীতে এতখানি সময় নষ্ট করে তোমাকে দেয়া মূল কাজ দাসত্বের কতখানি পালন করেছ তুমি? — এরকম জটিল সময়ে অসহায় আর শূণ্য হয়ে থাকার কথা আমরা মনে হয় কেউই ভাবিনা। আমরা তারাই– যারা বিশ্বাস করি আমাদের মালিক, সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং আমরা তার অনুগত দাস হয়েই মুক্তি চাই হিসেবের দিনটিতে।

নসীম হিযাযীর হেজাজের কাফেলা, খুন রাঙ্গা পথ, আঁধার রাতের মুসাফির, সীমান্ত ঈগল পড়ে আমার শত-সহস্রবার মনে হয়েছে, এমন সাহিত্যিক অনেক বেশি থাকতে পারতো। এই রঙ্গে রঙ্গিন অনেকেই থাকতে পারত। যেই লেখা পড়ে মনে হয় চরিত্রটা আমার সুন্দর করা প্রয়োজন। আমার সত্যবাদী হওয়া দরকার, দ্বায়িত্ববান হওয়া দরকার। আমার মনে হতো এই জীবনের পরেও আরেকটা জগত আছে, যেখানে কিছু নিয়ে যাওয়াই এই জীবনের চেতনা। নসীম হিযাযীর কথাটা এনেছি কেবল উপমা হিসেবে। অন্য লেখকগণের কথাও এনেছি কিছু উদাহরণ হিসেবে। কিন্তু মূল জিনিসটা হলো 'কী চাই অনন্তে' — সেই বিবেচনা রেখে লেখনীকে ধারণ করা...

কেমন আমাদের লেখা? হতে পারে সেটা আমাদের রোজনামচা। হোক সেটা একজন দাসের লেখা। যাতে তার মনিবের নির্দেশ না এড়ানোর ছাপ থাকবে। হতে পারে সেটা অর্থনীতির উপর লেখা– সেখানে থাকুক একজন দাসের দাসত্বের ছাপ — যেখানে তার প্রভূ তাকে নির্দেশ আর আদেশ দিয়েছেন কিছু — যার আলোকে তার এই কাজ। হতে পারে সেটা গল্প — সেখানে থাকুক নীতির বাইরে না যাওয়ার প্রেরণা — আগুণের আহবান সেখানে যেন না থাকে। যদিবা চরিত্রগুলোকে নীচ কোন কিছুতে ইনভলভড দেখানোও লাগে — সেটা যেন পাঠকের কাছে নীচ ভাষায় না যায় — যেন শেষ টুইস্টটা থাকে সত্যের পথের দিকে এগিয়ে যাওয়ার। শব্দময়তার ঝংকার তুলে যদি কন্যা নূপুর পরেই হাঁটে আমার গল্পে — সে পাঠকেরও চিত্তকে চঞ্চল করে নতুন কোন অনর্থের সৃষ্টি না করুক! এই চিরন্তন চঞ্চল মন প্রতিটি সুস্থ পুরুষের মাঝে আপনাতেই থাকে, তাকে জাগাতে হয়না,

জাগতে শেখাতেও হয়না!

একজন দাসের আচরণ আর কেমন হতে পারে? দাসের সৃষ্টি কেন প্রভূর কথার বাইরে হবে? তাইতো এই সাহিত্য মানেই পথভ্রষ্টতা নয়। চোখের সামনের সমস্ত পাঠ্যের হয়ত ৯৮ শতাংশ ভ্রষ্টকথা। এই স্রোত আমায় মুক্তি দিবেনা! মুক্তির জন্য নিজেকেই ভাবতে হবে। আমাদের হয়ত মনে রাখা দরকার — এই সৃষ্টিশীলতা যেন সীমাহীন উত্তাপের দিকে নিয়ে না যায়। কেননা, একদম সবকিছুর শেষে কেবল দুটি জিনিসই থাকবে — প্রশান্তি, আর উত্তাপ।